গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ নোয়াখালী

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
মোঃ সাইদ ইফতেখার

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
নোয়াখালী

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই- মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : নোয়াখালী

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএম প্রকল্প একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হচ্ছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং মোঃ সাইদ ইফতেখার যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এ বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এ বইটি লেখা হয়েছে নোয়াখালী জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এ বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এ বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এ বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এ বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এ বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বিবিএস-এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে নোয়াখালীর উপরে লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. ইসলাম, মোঃ ফখরুল, ১৯৯৮। বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস। লক্ষ্মীনারায়ণপুর, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী। নোয়াখালী, ডিসেম্বর ১৯৯৮।

২. বি.বি.এস., ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ নোয়াখালী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল ২০০১।

৩. বি.বি.এস., ১৯৯২। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ নোয়াখালী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

৪. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৫. PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report). Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh. Dhaka, August 2001.

৬. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৭. N. I. Khan, 1977. Banglaesh District Gajetteers Noakhali. Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, May 1977.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নোয়াখালী জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব এম.এ. সিকান্দার, কো টিম লিডার, চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, নোয়াখালী।
- জনাব অসিত রঞ্জন পাল, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, নোয়াখালী বন বিভাগ, নোয়াখালী।
- জনাব এম. এ. আউয়াল, প্রকল্প সমন্বয়কারী, নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, নোয়াখালী।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা ১
এক নজরে নোয়াখালী ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারনী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৭
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
খনিজ সম্পদ ১০
কৃষি সম্পদ ১০
দুর্যোগ ১১
বিপদাপন্নতা ১২

জীবন ও জীবিকা ১৩
জনসংখ্যা ১৩
জনস্বাস্থ্য ১৩
শিক্ষা ১৪
অভিবাসন ১৪
সামাজিক উন্নয়ন ১৪
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৪
প্রধান জীবিকা দল ১৫
দারিদ্র্য ১৫

নারীদের অবস্থান ১৭

অবকাঠামো ১৯
রাস্তা-ঘাট ১৯
পোল্ডার ১৯
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ১৯
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১৯
অর্থনৈতিক অবকাঠামো ২০
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২০
কৃষি অবকাঠামো ২০
উন্নয়ন প্রকল্প ২১

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা ২৩
পরিবেশগত সমস্যা ২৩
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৪

সম্ভাবনা ও সুযোগ ২৭
কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ২৭
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ ২৭
শিল্প উন্নয়ন ২৮
আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২৯

ভবিষ্যতের রূপরেখা ৩১

দর্শনীয় স্থান ৩৩

জেলা মানচিত্র

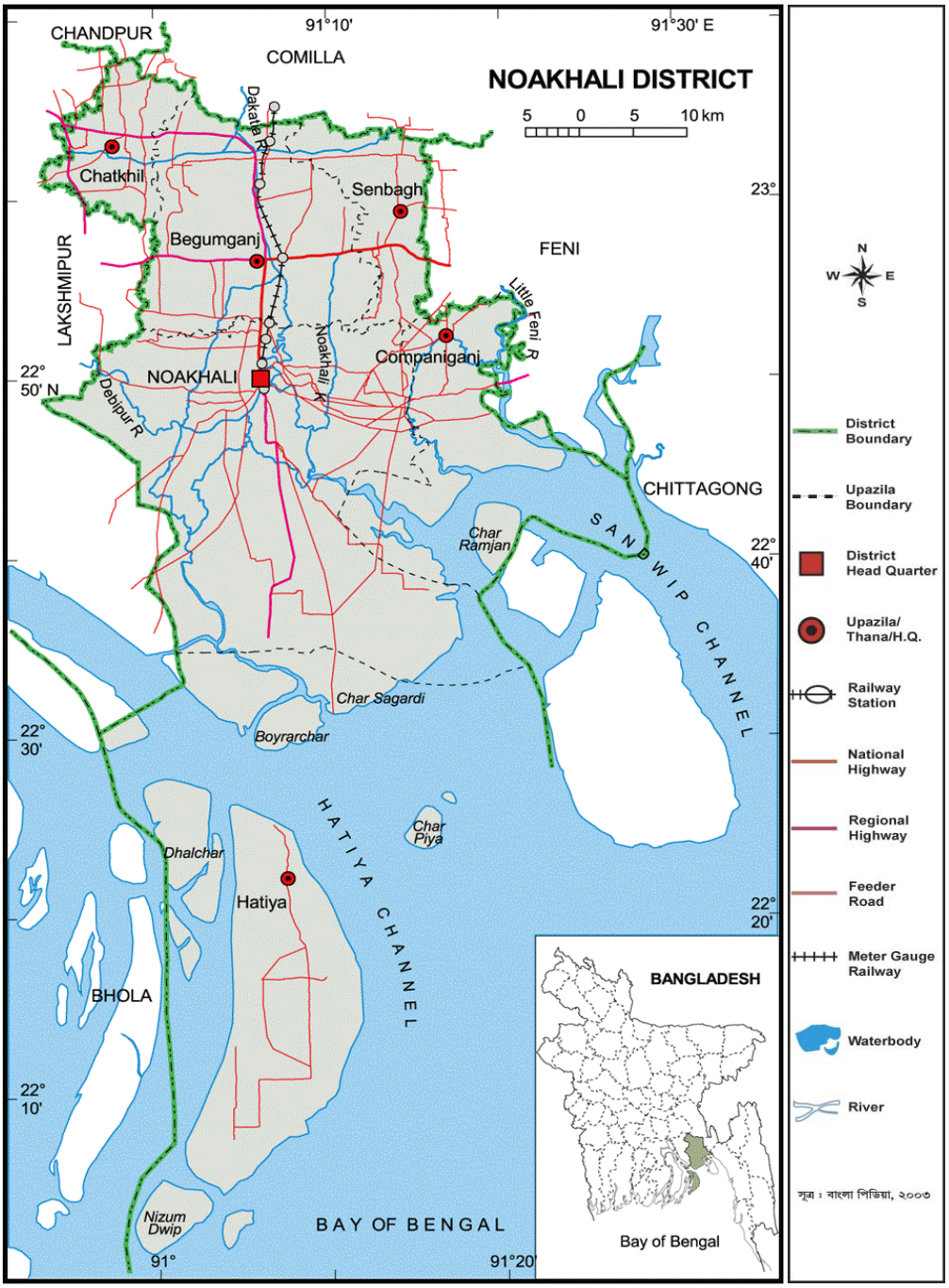

NOAKHALI DISTRICT
5 0 5 10 km
91°10'
91°30' E
23°
22° 50' N
22° 40'
22° 30'
22° 20'
22° 10'
91°
91°20'
CHANDPUR
COMILLA
FENI
LAKSHMIPUR
CHITTAGONG
BHOLA
Chatkhil
Senbagh
Begumganj
Companiganj
NOAKHALI
Hatiya
Dakatia R
Little Feni R
Noakhali K
Debipur R
Char Ramjan
Char Sagardi
Boyrarchar
Char Piya
Dhalchar
Nizum Dwip
SANDWIP CHANNEL
HATIYA CHANNEL
BAY OF BENGAL
BANGLADESH
Bay of Bengal
N
W
E
S
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/ Thana/H.Q.
Railway Station
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Meter Gauge Railway
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বঙ্গোপসাগরের পাড়ে মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত নোয়াখালী জেলা মেঘনা নদীর ভাঙ্গা-গড়া দ্বারা প্রভাবিত। এ জেলার অধিকাংশ এলাকা মেঘনা নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত। ফলে একদিকে যেমন বঙ্গোপসাগরের প্রভাব এ জেলার উপর রয়েছে তেমনি মেঘনা নদীও এ জেলার প্রকৃতি ও মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। নোয়াখালী জেলা চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে কুমিল্লা, পূর্বে ফেনী ও চট্টগ্রাম, পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

নোয়াখালী জেলার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। ধারণা করা হয় ১৪০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টপূর্বে প্রথম এ এলাকায় মানব বসতি গড়ে উঠে। প্রাচীনকালে এ এলাকা সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২২ সালের ২৯শে মার্চ 'ভুলুয়া' বা ভোলা নামে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলায় তখন দক্ষিণ শাহবাজপুর (বর্তমানে ভোলা) অন্তর্গত ছিল। ১৬৬০ সালের দিকে ত্রিপুরার পাহাড় থেকে বয়ে আসা পানিতে ভুলুয়া জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। এ দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে এ সময় ডাকাতিয়া নদী থেকে রামগঞ্জ, সোনাইমুড়ি ও চৌমুহনীর উপর দিয়ে একটি খাল খনন করা হয়, যাকে বলা হয় নোয়া (নতুন) খাল। বলা হয় নোয়াখালী জেলার নামকরণ এ খালের নামানুসারেই হয়েছে। ১৮৬৮ সাল থেকে ভুলুয়া জেলা নোয়াখালী নামে পরিচিত হতে থাকে। জেলার সদর নোয়াখালীর পশ্চিম তীরে সুধারাম নামক স্থানে স্থাপিত হয়। এ জেলার মানুষ ১৮৩০ সালের জিহাদ আন্দোলন এবং ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী এ জেলা ভ্রমণ করেন।

এ জেলার মোট আয়তন ৩,৬০১ বর্গ কি. মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৪৪%। জেলার মোট লোক সংখ্যা ২৫.৭১ লাখ। আয়তনের দিক দিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এ জেলার অবস্থান ৫ম এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে ২য়।

উপজেলা	**৬ টি**
পৌরসভা	**৫ টি**
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	**১২৮ টি**
মৌজা/মহল্লা	**১,০১৭ টি**
গ্রাম	**৯৭৯ টি**

৬টি উপজেলা, ৫টি পৌরসভা, ১২৮টি ইউনিয়ন / ওয়ার্ড, ১,০১৭টি মৌজা/মহল্লা ও ৯৭৯টি গ্রাম নিয়ে নোয়াখালী জেলা গঠিত। নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, সেনবাগ জেলার ছয়টি উপজেলা। উপজেলাগুলোর মধ্যে নোয়াখালী সদরের আয়তন সবচেয়ে বড়। যদিও বেগমগঞ্জ উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। এদের মধ্যে হাতিয়া একটি দ্বীপ উপজেলা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্নিঝড় / জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে নোয়াখালী

	বিষয়	একক	নোয়াখালী	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৬০১	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৬	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৮৩	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৫	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৪৫	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,০১৭	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৯৭৯	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৫.৭১	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	১২.৬৭	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	১৩.০৪	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৭১৪	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০:৯৭	১০০:১০৫	১০০:১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৬	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.৬	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৮.৪৫	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৫	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৯	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৬	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৭৬	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১১৬	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	৩৭৮	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৩,৯৩৮	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৭৫২	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২০	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩৩	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৬	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৬৫	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৩৪	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৭	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫০	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৩	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৮	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৪	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬০	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫০	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৯৯	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৪	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৩	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৬,০৯৪	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫১	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৯	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৯	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৮	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১৪	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৩	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৬%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে অনেক বেশি।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), জাতীয় হারের (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) চেয়ে বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) সমান।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫০%, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় (৫১%) সমান ও জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৫১) সমস্ত উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম; কিন্তু জাতীয় (প্রতি হাজারে ৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার ৪৩% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) তুলনায় অনেক বেশি; কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় কম।
- নিম্নমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।
- পর্যটনের দিক থেকে আকর্ষণীয়।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- নোয়াখালী জেলার মাথাপিছু আয় (১৩,৯৩৮ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের গড় আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম ।
- জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৬৫%, ৩৪%), জাতীয় (৪৯%, ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় অনেক বেশি ।
- জেলার মোট গৃহের ৮৪% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) হারের তুলনায় অনেক কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৭%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ২৯% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা (৬৫%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা (৫৪%) জাতীয় হারের তুলনায় বেশি (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) সমান।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় বেশি।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৩%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার মোট আয়তনের ৪২% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৬,০৯৪ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ১১৬ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যার ভাগ (১১%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।

উপজেলা তথ্য সারনী

	বিষয়	একক	নোয়াখালী	উপজেলা		
				সদর	বেগমগঞ্জ	চাটখিল
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৬০১	১০৭২	৪২৬	১৩৪
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	১২৮	৩৯	৩৫	১৮
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,০১৭	৩৩৪	৩৪৬	১৩৬
	গ্রাম	সংখ্যা	৯৭৯	২৮৪	৩৪৭	১২৯
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	২৫.৭১	৭.৬৫	৭.৬৭	২.১১
	পুরুষ	লাখ	১২.৬৭	৩.৮৩	৩.৭১	১০.০
	নারী	লাখ	১৩.০৪	৩.৮১	৩.৯৫	১.১০
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৭১৪	৭১৪	১,৮০০	১,৫৮০
	নারী পুরুষের অনুপাত	অনুপাত	৯৭	১০১	৯৪	৯১
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৪.৬	১.৩৫	১.৩২	০.৩৮
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৬	৫.৬৭	৫.৭৮	৫.৪৮
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৮	৩.৩	২.৪	৪.৭
শৌচ অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৫	১৫	তথ্য নাই	২৮
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৪১	তথ্য নাই	৮৮
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১০	৮	১৬	১৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১,৪৩৮	৪০৩	৪১১	১৩৫
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৩৫১	৭০	৬৯	২৯
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৩২	১০	৮	৪
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৩৩	৩২	২১	২৩
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৭৫	৭৭	৭৬	৮১
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৫	২৩	২৪	১৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১৪২,০৫৬	৫৭,০০৯	২৪,৮০৫	৭,২৯২
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪৫	৪৬	৭১	তথ্য নাই
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪০	৪৩	২২	তথ্য নাই
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৫	১১	৭	তথ্য নাই
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৫,০০০	৭,০০০	৫,০০০	১৪,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	%	৫০	৪৬	৫৪	৬৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৭	৯৫	৯৫	১০৬
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০০	৯৪	১০০	১১২
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	২৫,৮৪০	৭,১১১	৮,০৪৬	২,১৮৬
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৭৬	৬৩	৮৫	৯১
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮	৭	৮	১৫

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
কোম্পানীগঞ্জ	হাতিয়া	সেনবাগ	
৩০৫	১৫০৮	১৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৭	১০	৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪৭	৫৫	৯৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪৫	৬৩	১১১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.১৪	৩.৪১	২.৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০.৮	১.৭৪	১.২৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.০৬	১.৬৬	১.৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৭০৩	২২৬	১,৭৩৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০২	১০৫	৮৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৩৮	০.৬৭	০.৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.৬০	৫.০৩	৫.৬৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৪	৩.১	১২.১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৫	১২	২৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৬০	২২	৬৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৮	১	৮	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১১৪	২২৫	১৫০	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
২৯	২৮	২৬	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৪	৩	৩	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৩০	৪১	১৯	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭০	৬৫	৭৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩০	৩৫	২৪	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
১৩,২৮৫	২৮,৯৮২	১০,৬৮১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৫৯	৩৮	তথ্য নাই	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
২৫	৪৬	তথ্য নাই	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
১৬	১৬	তথ্য নাই	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৮,০০০	৬,০০০	৬,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৪৮	৩৭	৫৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৭	৯৮	৯৮	২০০১(প্রা.শি.অ)
৯৬	১১৩	১০১	২০০১(প্রা.শি.অ)
২,৭৯৫	২,৯৫৪	২,৭৪৮	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
৭৮	৭৪	৮২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৮	৩	৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

একদিকে সাগর ও নদীর প্রভাব, বিস্তীর্ণ চর ও নতুন জমি, দ্বীপ, বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন -এ সবই নোয়াখালী জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অববাহিকায় অবস্থানের ফলে সাগর ও নদীর প্রভাব যেমন অত্যন্ত বেশি তেমনি মূল ভূ-খণ্ডের ভূ-প্রকৃতিও জেলার পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু : দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থানের জন্য এ জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। বাতাসে উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা আছে। এ জেলার তাপমাত্রা সমভাবাপন্ন এবং জুন থেকে অক্টোবর মাসে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সাধারণত ১৪.৬° সে. থেকে ৩৩° সে. এর মধ্যে থাকে। জানুয়ারিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকে প্রায় ৭৭%, যা জুলাই মাসে বেড়ে প্রায় ৯০% হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩,৩০০ মি: মি:। এ জেলার দ্বীপগুলো ও সাগরের কাছাকাছি এলাকাগুলো প্রায়ই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়।

জলবায়ু	সমভাবাপন্ন
তাপমাত্রা	১৫° সে. - ৩৩° সে.
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৭৭% - ৯০%
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	প্রায় ৩,৩০০ মি. মি.

নদী ও মোহনা : এ জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে মেঘনা, হাতিয়া, বামনি ও বুড়িচর। নদীগুলোতে সারাবছরই পানি থাকে। এ ছাড়া জেলার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কিছু খালের উপরও নির্ভরশীল। এর মধ্যে নোয়াখালী এবং বিরেন্দ্রখাল অন্যতম। সব মিলিয়ে নদ-নদীগুলো প্রায় ৮০৫ বর্গ কি. মি. এলাকাতে বিস্তৃত, যা সমগ্র জেলার প্রায় ২২%।

নোয়াখালী জেলার নীচের অংশ মেঘনা নদীর দ্বারা প্রভাবিত। প্রতি বছরই অনেক এলাকা নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন চরও জেগে উঠছে। এক জরীপে দেখা গেছে মেঘনা অববাহিকায় প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমি নদীতে বিলীন হয়ে যায়। গত ২০ বছরে প্রায় ১০ মিলিয়ন লোক নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে ভূমিহীন হয়েছে এবং এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ভাঙনের ফলে মূল্যবান সম্পত্তি, রাস্তা-ঘাট, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ হাজার হাজার একর ফসলী জমি নষ্ট হয়। ফলে এলাকার উন্নয়ন যেমন বাধাগ্রস্ত হয় তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকের পুনর্বাসনও একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর পরিমাণ জমি জেগে ওঠে। অর্থাৎ দেখা যায় যে, জমির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ছে। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, আগামী ত্রিশ বছরে মেঘনার পূর্ব ও পশ্চিম পাশ, হাইমচর ও উত্তর হাতিয়া ভাঙ্গতে থাকবে। তবে বয়ার চরে আরো নতুন জমি জেগে উঠতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে এ হার আরো বাড়ানো সম্ভব।

সময়	জমি জেগে ওঠার হার (হে.প্রতি বছরে)	জমি ভাঙনের হার (হে.প্রতি বছরে)
১৯৭৩-১৯৭৯	৮,৩৬৩	৫,৪৭৯
১৯৭৯-১৯৮৪	৯,১১০	৬,২২২
১৯৮৪-১৯৯০	৫,৫৮৪	৭,০৬৮
১৯৯০-১৯৯৬	৯,৪২০	৪,৮৬৪
১৯৯৬-২০০০	৫,৯৬৩	৮,০৬৫
১৯৭৩-২০০০	৫.০৮০	৩.১৯৯

মাটি : নোয়াখালী জেলা প্রধানত দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত; যথা (ক) নিম্নতর মেঘনা নদীর পললভূমি এবং (খ) নতুন মেঘনা মোহনা পললভূমি। এখানকার মাটি মূলত নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত, যার মধ্যে কিছু পরিমাণ বালির মিশ্রন রয়েছে। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের মাটি কিছুটা ক্ষারীয়। মাটিতে কিছু পরিমাণ লবণ আছে। জেলায় কৃষি জমিতে সাধারনত সর্বোচ্চ গড় ১৫ পি.পি.এম. লবণাক্ততা দেখা যায়। কিন্তু চরগুলোতে লবণাক্ততা আরো অনেক বেশি থাকে। নোয়াখালী সদর ও হাতিয়া উপজেলার ৭টি চরের মাটির উপর 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প' পরিচালিত একটি সমীক্ষাতে সর্বোচ্চ ৩১,৬৮০ পি.পি.এম. লবণাক্ততা দেখা গিয়েছে।

সাগর : জেলার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবন জীবিকাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিচিত্র ধরনের জীব ও সম্পদের সমাবেশ সাগরের লোনা পানি ও বেলাভূমিতে। জেলার অনেক মানুষই এ সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

বনভূমি : নোয়াখালী বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে জানা যায় যে, জেলায় মোট বনভূমির পরিমাণ ৫৬,০০০ হেক্টর। তবে এর মধ্যে ১১,৬৮১ হেক্টর বনভূমি নদী ও সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং প্রায় ২০,০০০ হেক্টর বনভূমি গত কয়েক দশকে পর্যায়ক্রমিকভাবে জবরদখল হয়ে গেছে। নোয়াখালী জেলায় প্রাকৃতিক কোন বন না থাকলেও বন বিভাগের চেষ্টায় ও স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে বর্তমানে বিপুল পরিমাণ এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরে প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন যে, যে সব এলাকায় গাছপালার আচ্ছাদন ছিল সে সব এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। তাই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্পের আওতাধীনে জেলার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনি সৃজন করা হয়।

এ বন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষা করে, অপরদিকে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদেরও জোগান দেয়।

দ্বীপাঞ্চল : নোয়াখালী জেলায় অনেকগুলো দ্বীপ আছে। সব মিলিয়ে এ জেলার ৪৩ শতাংশ এলাকা জুড়ে দ্বীপাঞ্চল আছে। হাতিয়া একটি দ্বীপ উপজেলা। উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ও দ্বীপ সংলগ্ন চরগুলো হল বাদনের চর, ডামার চর, চর বন্দরটিলা, বুড়ির চর, হাতিয়া, চর জাহাজমারা/চর ম্যাকফরসন, চর কিং, দক্ষিণ হাতিয়া, মৌলভীর চর/ ডিক্রির চর, ঢাল চর, নিঝুম দ্বীপ। এদের মধ্যে বাদনের চর, হাতিয়া, বুড়ির চর, দ্বীপ বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত। দ্বীপগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই মানুষ বাস করে। মাছ ধরা, কৃষি, পশুপালন দ্বীপবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস। তবে প্রতিটি দ্বীপই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়ের শিকার। তীব্র স্রোত ও জোয়ার-ভাটার ফলে অনেক দ্বীপেরই আকার ও আয়তন বদলাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি দ্বীপের বৈশিষ্ট্য পাশের সারণীতে দেখানো হল।

নাম	আয়তন(হে.)	জনসংখ্যা	প্রাকৃতিক সম্পদ	অবকাঠামো
ডামার চর	৭০৩	-	ম্যানগ্রোভ বন, মাছের বিচরণ ক্ষেত্র	-
হাতিয়া	১৫০,৮০০	৩.৪ লাখ	ম্যানগ্রোভ বন, সামুদ্রিক মাছ, চারণভূমি	বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার
মৌলভীর চর	৬৫৭	৬০ জন	সামুদ্রিক মাছ	-
নিঝুম দ্বীপ	৫১৬	৪,৭৪২ জন	ম্যানগ্রোভ বন, সামুদ্রিক মাছ, চারণভূমি	-

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : নোয়াখালী বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত এমন একটি জেলা যেখানে প্রচুর পরিমাণ এলাকা নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত। তাই এখানে গাঙ্গেয় পলল ভূমির উদ্ভিদ থেকে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই প্রচুর পরিমাণ গাছপালা আছে।

বাড়ীতে জন্মানো গাছের মধ্যে আম, গাব, জাম, তাল, তেতুল, কাঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বরই, পেয়ারা, লিচু, কামরাঙ্গা, আতা, হরিতকী, আমলকি অন্যতম। এ ছাড়া অনেক লোকই বাদাম ও কলাগাছ লাগিয়ে থাকে।

স্থানীয় গাছের মধ্যে কড়ই, শীল কড়ই, জারুল, শিমূল অন্যতম। এ ছাড়াও শিশু গাছ রাস্তার পাশে ও বাড়িতে লাগানো হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মান্দার নামের এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ বেড়া ও জ্বালানির জন্য লাগানো হয়। আকাশমণি, ইপিল ইপিল, অর্জুন, ইউক্যালিপটাস গাছও দেখা যায়। প্রধানতঃ কেওরা গাছ দিয়ে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে।

এ জেলায় পাম জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে। জেলার উত্তরে ও পশ্চিমে সুপারি গাছ প্রচুর জন্মে থাকে। নারিকেল গাছ সারা জেলায়ই জন্মে। তাল ও খেজুর গাছ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এ জেলায় বিভিন্ন জাতের বেত, বাঁশ ও ছন জন্মে। জলা এলাকার সোলা ও শীতল পাটি দেখা যায়, যা বিভিন্ন প্রকার মাদুর ও ঝুড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী : অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বনের অভাবে এ জেলায় কোন বড় বা মাঝারি ধরনের মাংসাশী প্রাণী দেখা যায় না। তবে শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বাগডাসা, উদবিড়াল, কাঠবিড়াল, বেজি, বিভিন্ন প্রকার ইঁদুর ও বাঁদুড় দেখা যায়। যদিও এদের অনেকগুলোই আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সারা দেশের মতো এখানেও প্রায় সব ধরনের পাখিই দেখা যায়, যাদের মধ্যে শকুন, বাজ, গাংচিল, চিল, কানি বগা, গো বগা, কালা বগা, কাক, মাছরাঙ্গা অন্যতম। বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আছে। এ ছাড়াও জলচর পাখি যেমন পানকৌড়ি, ডাহুক, কোরা, পিটালী, রাজহাঁস অন্যতম। এদের পাশাপাশি এ জেলায় দোয়েল, কোকিল, হলদি পাখি, ফিঙ্গে, ময়না, শালিক, বুলবুল, টুনটুনি, শ্যামা, বাবুই, কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। শীতকালে এ জেলায় প্রচুর অতিথি পাখি আসে। নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশে শীতকালীণ অতিথি পাখিদের বিচরণক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম । শীতকালীন যাযাবর পাখিদের দুটো আর্ন্তজাতিক পথ, পূর্ব-এশিয় অষ্ট্রেলেশিয়ান ফ্লাইওয়ে এবং মধ্য-এশিয় ফ্লাইওয়ে, এই দ্বীপের উপর দিয়ে গিয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ৯৮ প্রজাতির বিশ হাজার যাযাবর পাখি এই দ্বীপ ও তার আশেপাশের অঞ্চলে দেখা যায়। এ ছাড়াও এই দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে। সুন্দরবন থেকে হরিণ ও বানর এনেও ছাড়া হয়েছে। অসামান্য জীব বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করে ২০০১ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি (নং-পবম (শা-৩) ৮/২০০১/২৯৮ তাং ০৮/৪/২০০১) অনুসারে নিঝুম দ্বীপ ও সংলগ্ন এলাকার মোট ৪০,৩৯০ একর বনভূমিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছও এ জেলায় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় মাছগুলো হল রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউশ, আইড়, টেংরা, মাগুর, শিং, শোল, বোয়াল, গজাড়, পাবদা, কই, মুড়লা, পুটি, বাইন এবং চেলা। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা পুকুর ও দীঘিতে চাষ করা হয়।

সাগরে রয়েছে অফুরন্ত জীব বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রূপালী ও সাদা রূপচান্দা, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, সাদা দাতিনা, তুল্লার ডাণ্ডি, বাটা, ফানসা, গুইচ্চা, ভেটকি, লাল পোয়া, চাপাকড়ি, চম্পা, সারডিন, বম মাইট্টা ও বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি যেমন বাগদা, বাঘতারা, ডোরাকাটা, চাগা, বাঘাচামা, ইরিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সাগর পাড়ের অগভীর জলে রয়েছে নানা প্রজাতির জীব যেমন শামুক, ঝিনুক, কস্তুরা বা ওয়েস্টার, কাঁকড়া, লবষ্টার, শৈবাল বা সী উইড, সামুদ্রিক শসা, শিরোপদী। এ ছাড়া সাগর উপকূলে নানা প্রজাতির স্পঞ্জ, জেলী মাছ ও প্রবাল আছে।

খনিজ সম্পদ

নোয়াখালী জেলা প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ একটি জেলা। ১৯৭৭ সালে এ জেলার বেগমগঞ্জে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, এ গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস মজুত আছে। গ্যাসের সম্ভাব্য প্রাপ্যতা অনুসারে সমগ্র দেশকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে নোয়াখালী ১০ নম্বরে পড়েছে। বর্তমানে নোয়াখালীতে গ্যাস জরীপের কাজ চলছে এবং এখানে আরো গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

আবিষ্কারের সময়	১৯৭৭
গ্যাসের মজুদ	৪৬ বিলিয়ন কিউবিক ফুট
আহরণযোগ্য গ্যাসের মজুদ	৩২ বিলিয়ন কিউবিক ফুট

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে মোট আবাদকৃত জমির ২০% উঁচু জমি, ৭০% মাঝারি জমি এবং ১০% নিচু জমি। জেলার অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি ও নিচু জমিতে বর্ষাকালে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রধান ফসল : জেলার অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ২ লাখ হে. জমিতে কৃষিকাজ করা হয়ে থাকে, যা সমগ্র জেলার ৫১%। জেলার প্রধান ফসল ধান (প্রায় ৮২% জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে)। বোরো, আমন ধান চাষ এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে বাদাম, পাট, বিভিন্ন প্রকার ডাল, মরিচ, তেলবীজ, আদা, আখ ও আলু অন্যতম। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শস্য নিবিড়তার মান ১৬৯, যা উপকূল অঞ্চলের গড়ের সমান; কিন্তু বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক কম।

কৃষি জমির ব্যবহার	
উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ	১.৭৮%
উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন	৩.৬৩%
উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো	৯.৫৫%
স্থানীয় জাতের ধান	৬৭.৭৫%
গম	০.১৬%
আলু	০.৫%
সবজি	১.৭%
মসলা	৩.৫৩%
ডাল	৬.৬৭%
তেল বীজ	৪.২৭%
আখ	০.১৩%
পাট	০.২৬%

পশু সম্পদ : নোয়াখালীতে ৩৭% গ্রামীণ বাড়িতে গবাদিপশু আছে এবং বাড়িপ্রতি গবাদিপশুর পরিমাণ গড়ে ২.২৩। এ হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম।

নদী-সাগরের মাছ : নোয়াখালীতে অভ্যন্তরীণ নদ-নদী থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়, যা একদিকে যেমন লোকের খাদ্যের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি জেলার অর্থনীতিতেও অবদান রাখে। ২০০১-০২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জেলার নদ-নদী, মোহনা ও জলাভূমি থেকে প্রায় ১৬ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৬%। এ ছাড়াও

অনেক লোক সামুদ্রিক মাছ ধরেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

মাছ চাষ : ২০০১-০২ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জেলার পুকুরগুলো থেকে প্রায় ৩৭ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (উপকূলের প্রায় ১৩%)। যদি সংস্কারযোগ্য পুকুরগুলোকে মাছ চাষের আওতায় আনা যায়, তবে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। নোয়াখালী জেলায় বর্তমানে প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও লোকজনের উৎসাহের কারণে আশা করা যাচ্ছে যে এ হার আরো বাড়বে এবং জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য নোয়াখালী জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরে প্রধানত দুটি ভিন্ন প্রকারের সাইক্লোন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন ও অপরটি হচ্ছে মৌসুমী নিম্নচাপ। সাইক্লোনের সময় বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৪০ কি.মি. পর্যন্ত উঠতে পারে। এর সাথে ৬ থেকে ৭ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস এবং তীব্র বৃষ্টিপাতও দেখা যায়। ১৫৮২-১৯৯৭ সালে এ অঞ্চলে ৩৩টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়গুলো প্রধানত মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আঘাত হেনে থাকে।

নোয়াখালী জেলায় আঘাত হেনেছে এমন কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান

সময়কাল	বাতাসের গতি (কি.মি./ঘন্টা)	জোয়ারের উচ্চতা (ফুট)	ক্ষয়ক্ষতি
অক্টোবর ১৯৮৩	৯৩	-	-
নভেম্বর ১৯৮৩	১৩৬	-	-
নভেম্বর ১৯৮৬	৯০-১১০	২-৩	-
এপ্রিল ১৯৯১	২২৫	২০	১৩৮,৮৮২ জন মৃত
জুন ১৯৯১	৭৫-১১০	৬	-
মে ১৯৯৭	২২০	১০	-
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	১৫০	৬-১০	-
মে ১৯৯৮	১২০	৬-৮	-

আর্সেনিক : বি.জি.এস ও ডি.পি.এইচ.ই-র একটি গবেষণা (২০০১) থেকে দেখা গেছে যে, নোয়াখালী জেলার নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৩২ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে যে নলকূপগুলোর মধ্যে ৬৯ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : নোয়াখালী জেলার মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ ও ১০ পি.পি.এম। পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয়, অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। এ ছাড়া মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না।

জলাবদ্ধতা : জেলায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান সমস্যা। জেলায় মাঝারি নিচু জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই এ জমিগুলো প্লাবিত হয় এবং পানি সরে যাওয়ার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ৫/৬ মাস পর্যন্ত এভাবেই থেকে যায়। ফলে রোপা আমন ধানের সুযোগ থাকলেও তা করা যায় না।

বন্যা : নোয়াখালী জেলায় বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবগুলো উপজেলাই কম বেশি বন্যাতে আক্রান্ত হয়। ২০০২ সালের বন্যায় এ জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

নদী ভাঙন : নদী ভাঙন একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর শত শত একর জমি নদীবক্ষে বিলীন হয়ে যায়। এ ভাঙন হাতিয়া উপজেলায় বেশি দেখা যায়। মেঘনা নদীর তীব্র স্রোতের কারণে হাতিয়া দ্বীপের প্রায় তিন দিক থেকেই

ভাঙছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, গত ৫৫ বছরে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকার সম্পত্তি নদীবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। এ ছাড়া, বেশ আগে ভূমি ভাঙনের জন্য নোয়াখালী সদর উপজেলার প্রাণকেন্দ্র সুধারাম থেকে মাইজদী এলাকায় সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল।

বন উজাড় : বনদস্যু ও বিভিন্ন বাহিনীদের উপদ্রবের ফলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে শত শত একর বনভূমি। খাস জমি দখল ও নগদ অর্থের জন্য চলে বন ধ্বংসের মহোৎসব। এলাকার জোতদার ও টাউটরা ভূমিহীনদের সামনে রেখে দখল করে নিচ্ছে বনভূমি। ফলে এলাকার পরিবেশ যেমন বিপন্ন হচ্ছে তেমনি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর অগভীর পানির মাছ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা শব্দটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না, তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে বিপদাপন্ন হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪) দেখা যায় যে, নোয়াখালী জেলার মানুষ প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিপদাপন্ন হয়। নোয়াখালী জেলার ক্ষুদ্র কৃষকেরা জলাবদ্ধতা, বন্যা, কাজের সুযোগের অভাব, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, ঘূর্ণিঝড়, ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া ইত্যাদি কারণে প্রধানত বিপদাপন্ন হয়। জেলেদের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়, মাছের পরিমাণ হ্রাস, পুঁজির অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা কাজের সুযোগের অভাব, নিম্ন মজুরি, বন্যা, পুঁজির অভাব, পেশাগত দক্ষতার অভাব, ঘূর্ণিঝড়, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিপদাপন্ন হয়।

নোয়াখালী জেলার নির্বাচিত কিছু পেশাজীবীদের বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	জলাবদ্ধতা, বন্যা, কাজের সুযোগের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, বড় পরিবার, ঘূর্ণিঝড়, ফসলের উপযুক্ত দাম পাওয়া ইত্যাদি।
জেলে	ঘূর্ণিঝড়, মাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, পুঁজির অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, মাছ ধরার উপকরণের অভাব ইত্যাদি।
গ্রামীণ শ্রমিক	কাজের সুযোগের অভাব, নিম্ন মজুরি, বন্যা, পুঁজির অভাব, ঘূর্ণিঝড়, খাস জমির দখলিস্বত্ব বজায় রাখা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা।
শহুরে শ্রমিক	কাজের সুযোগের অভাব, পেশাগত দক্ষতার অভাব, নিম্ন মজুরি, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, বন্যা, আর্সেনিক, পানিবাহিত রোগ, জলাবদ্ধতা, ইত্যাদি।

উৎস: সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

নোয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যা ২৫.৭১ লাখ। যার মধ্যে ১২.৬৭ লাখ পুরুষ এবং ১৩.০৪ লাখ নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৭। মোট জনসংখ্যার ৮৯% লোক গ্রামে বাস করে। জেলায় মোট খানা / পরিবারের সংখ্যা ৪.৬ লাখ। প্রতিটি খানার গড় আকার ৫.৬ জন, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। নোয়াখালী জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭১৪ জন লোক বাস করে, যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক কম। উপজেলাগুলোর মধ্যে চাটখিল উপজেলায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে, কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

শহুরে জনগণ (লাখ)	২.৮১
পুরুষ	১.৪১
নারী	১.৩৯
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	২.২৯
পুরুষ	১.১৩
নারী	১.১৬
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:৯৭
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	১.১৩
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৭১৪

জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৫.৯% ০-১৪ বছর বয়সী, যা উপকূলীয় অঞ্চলের হারের তুলনায় অনেক বেশি। অপরদিকে ৭% লোকের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে। তাই বয়সগত দিক দিয়ে এ জেলার জনগণের নির্ভরশীলতার অনুপাত ১.১৩; যা উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি।

২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মাত্র ১১ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। এ অনুপাত ১৯৯১ সালে ছিল ১০%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে বাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩%।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ জেলায় ১টি সদর হাসপাতাল ও ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে। হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা ৪২২টি এবং শয্যাপ্রতি জনসংখ্যার অনুপাত ৬,০৯৪। এ হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে অনেক বেশি, যা স্বাস্থ্য সেবার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে। যদিও ৭টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ২৪টি গ্রামীণ ডিসপেনসারি আছে; তবে তাদের সেবার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

শিশু স্বাস্থ্য : এ জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫১ এবং পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৯। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯% অপুষ্টির শিকার। এ হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। মেয়ে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। অপরদিকে, ৭৩%, ৭৬% এবং ৮৫% শিশু যথাক্রমে হাম, ডিপিটি এবং পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। এ হার সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের চেয়ে সামান্য কম। জেলার ৬৭% ঘরে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

নির্ভরশীলতার অনুপাত	১.১৩
নবজাতক মৃত্যুর হার	৫১
অপুষ্টির মাত্রা	৯%

পানি, পয়ঃ ও বাসস্থান সুবিধা : ১৯৯১ সালের আদম শুমারী থেকে দেখা যায় যে, নোয়াখালী জেলার ১৫% ঘরের দেয়াল ইট বা টিনের তৈরি। এ হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। আবার জেলার ৪৯% ঘরের ছাদ ইট বা টিনের তৈরি। এ হারও উপকূলীয় গড়ের তুলনায় কম। অপরদিকে ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১% ঘর কলের এবং ৮৬% ঘর নলকূপের পানি ব্যবহার করে। এ ছাড়া ১১% ঘর গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। পুকুর ও অন্যান্য উৎসের পানি ১৬% ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নোয়াখালী জেলার লোকেরা সমগ্র

উপকূলের তুলনায় কল ও নলকূপের পানির সুবিধা কম পেয়ে থাকে। তার উপর আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপ জেলার লোকদের আরো বিপদগ্রস্ত করছে।

একই হিসাবে আরো দেখা যায় যে, ১৪% লোকের কোন প্রকার পায়খানার সুবিধা নেই, যা সমগ্র উপকূলের তুলনায় খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে। বাকি ৭৬ ভাগের প্রায় অর্ধেক ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহৃত হয় এবং বাকি অর্ধেকে হয় না।

শিক্ষা

নোয়াখালী জেলায় শিক্ষিতের হার ৫০%। এ হার উপকূলীয় গড়ের প্রায় কাছাকাছি। যদিও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার (৪৮%) পুরুষদের (৫৩%) তুলনায় কম। তবুও এ জেলায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে বেশি। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫৪%। হাতিয়াতে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম এবং চাটখিল ও সেনবাগে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি।

শিক্ষিতের হার (৭^{+})	৫০%
পুরুষ	৫৩%
মহিলা	৪৮%
শিক্ষিতের হার (১৫^{+})	৫৪%
পুরুষ	৬০%
মহিলা	৫০%

এ জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৪৩৮টি, যার মধ্যে ৭৭৬টি সরকারি। এ বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৪.৩ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। যার মধ্যে অর্ধেকই মেয়ে। এ জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির গড় হার ৯৭%, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অপরদিকে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের অনুপাত (৭২), উপকূলীয় গড়ের (৫০) চেয়ে বেশি এবং জনসংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ের ঘনত্বও অনেক কম (প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ৫.৭ টি)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৪৩৮ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫১ টি
মাদ্রাসা	১৪৭ টি
কলেজ	৩২ টি

এ জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫১টি এবং এতে মোট ১.৬ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। যার মধ্যে ৬০% ই ছাত্রী। জেলায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪৭টি এবং মোট ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করে। এ জেলায় মোট ৩২টি কলেজ আছে যেখানে প্রায় ২৭ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে।

এ ছাড়া ১টি আনসার-ভিডিপি ট্রেনিং সেন্টার, ১টি এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, ১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ১টি টেক্সটাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে।

অভিবাসন

বি.বি.এস, ১৯৯১ এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭% নোয়াখালীর বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নোয়াখালী জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয় : নোয়াখালী জেলার মোট আয় ৩৭৮ কোটি টাকা (১৯৯৯-২০০০), যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মোট আয়ের প্রায় ৬%। জেলাগত মোট আয়ের দিক থেকে এ জেলা উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে ৫ম স্থানে আছে। জেলার মোট

আয়ের ৪৮% ই আসে চাকরি বা সেবামূলক খাত থেকে। আয়ের ৩৬% কৃষিখাত থেকে আসে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি। অপরদিকে, আয়ের মাত্র ১৭% শিল্পখাত থেকে আসে। নোয়াখালী জেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬ শতাংশ হারে হচ্ছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল এবং সমগ্র বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। নোয়াখালী জেলায় মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৩,৯৩৮ টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক কম। মাথাপিছু আয়ের দিকে এ জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১৩ তম স্থানে এবং সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ৪৯ তম স্থানে আছে।

সক্রিয় জনশক্তি : ১৯৯৯-২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এ জেলায় মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৭.৫ লাখ এবং এর মধ্যে ৪৪% ই মহিলা। অপরদিকে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ১.৩ লাখ, যা জেলার মোট সংখ্যার ১৭%। আরো দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ১৬% বেড়েছে। এ হার উপকূল অঞ্চলের (৪%) তুলনায় অনেক বেশি।

প্রধান জীবিকা দল

কৃষক : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের ৭৫% পরিবার কৃষি কাজে জড়িত। এদের মধ্যে ৬৫% ক্ষুদ্র কৃষক, ৮% পরিবার মধ্যম এবং ২% পরিবার বড় কৃষক।

কৃষি শ্রমিক : চাষের জমির অভাব, কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে জেলায় অনেক লোকই তাদের জীবিকার জন্য কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বিবিএস এর কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুসারে দেখা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৩৩% পরিবার কৃষি শ্রমিক। তবে এই হার দিনে দিনে বাড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : নোয়াখালী জেলার শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোকজন সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে।

জেলে : জেলার অনেক লোক মাছ ধরার উপর নির্ভর করে থাকে। জেলার মোট গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৬% পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

দারিদ্র্য

এই জেলায় পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে ৬৫% লোক দরিদ্র সীমার নীচে এবং ৩৪% লোক অতিদরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই হার উপকূল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক বেশি। আবার গ্রামীণ জনগণের ৫৪% পরিবারই ভূমিহীন। চর ও দ্বীপগুলোতে বসবাসকারী লোকদের অবস্থা আরো শোচনীয়।

দরিদ্র	**৬৫%**
অতিদরিদ্র	**৩৪%**
ভূমিহীন	**৫৪%**
ক্ষুদ্র কৃষক	**৬৫%**

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নোয়াখালী জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এ হিসাব অনুযায়ী নোয়াখালী জেলা নিম্নমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতাপূর্ণ জেলা। নোয়াখালী জেলার নারীদের অবস্থান বিশেষ কিছু সূচকের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল।

লিঙ্গ অনুপাত : নোয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যার ৫১% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৭, যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের তুলনায় বিপরীতধর্মী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১০। কিন্তু প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৮২।

নারীর অবস্থান

- সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক বেশি।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বেশি।
- সক্রিয় শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশ গ্রহণ বেশি।
- লিঙ্গ অনুপাত (১০০:৯৭) নারীর অনুকূলে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি।
- ঘরে বা বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বাংলাদেশের হারের চেয়ে বেশি।
- কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারে নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা বেশি।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় বেশি ।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৩%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৬.১২, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। নোয়াখালী জেলার নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৪৫ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন । জেলার ৩৩% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩২% নারী বিবাহিত এবং ১% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৮% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রমশক্তি : সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় উপকূলীয় অঞ্চলেও নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। পর্দাপ্রথা, প্রথাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবে অকৃষিখাত বা চাকরি ও সেবামূলক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক কম হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নারীরা নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, সরকারি ও বেসরকারি সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রথাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৯-২০০০) অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে নোয়াখালী জেলার মোট শ্রমশক্তির ৪৪% ছিল নারী। এ হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আরো দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ

(৩৮%) গ্রামাঞ্চলের (৪৫%) তুলনায় কম, যদিও তা উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২০% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

কিন্তু, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের তুলনায় নারীদের মজুরি প্রাপ্তি অনেক কম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৬% নারী কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন প্রকার মজুরি পায় না। আবার যারা মজুরি পায় তারা পুরুষদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মজুরি পেয়ে থাকে। এ হার চর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্ধেকেও নেমে আসে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগতমান নারীদের অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নারীদের ৯৮%ই ঘরে সন্তান প্রসব করে থাকেন । এই হার বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। আবার প্রসবকালীন সময়ে ৯% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ৪% ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সহায়তা করে থাকেন। ৮৭% ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা সহায়তা করে থাকেন।

এ জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫১ জন, যা বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম। কিন্তু, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি। জেলার ৯% শিশুই চরম অপুষ্টির শিকার। মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (১৪%) ছেলে শিশুদের চেয়ে (৪%) অনেক বেশি।

শিক্ষা : শিক্ষা ক্ষেত্রে নোয়াখালী জেলার নারীরা কিছুটা এগিয়ে আছে। সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার হার (যথাক্রমে ৪৮% ও ৫০%) উপকূল ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও তা পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় কম। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলের তুলনায় বেশি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলোতে মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই মেয়ে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৬০% ই ছাত্রী। কলেজগুলোতে প্রায় ৪০% ছাত্রী। এ অবস্থান উপকূলীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

এ জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ৪৪২ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ২৯ কি. মি., আঞ্চলিক মহাসড়ক ১২ কি. মি. এবং উপজেলা সদরগুলোর মধ্যে সংযোগকারী সড়ক ৪০১ কি. মি.। এ ছাড়াও এলজিইডি-র অধীনে ২,২৮৯ কি. মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এ জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৭৬ কি. মি./বর্গ কি. মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল ঘনত্বের সমান। কিন্তু দ্বীপ ও চর অঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। তদুপরি দ্বীপগুলোর সাথে মূল ভূ-খন্ডের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম জলপথ। জেলার প্রধান দ্বীপ যেমন হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদির সাথে মূল ভূ-খন্ডের প্রধানত সি-ট্রাকের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন যান্ত্রিক নৌকাও চলাচল করে। তবে এদের চলাচল সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

পাকা রাস্তা	২,৭৩১ কি.মি.
সওজ রাস্তা	৪৪২ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	২,২৮৯ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৭৬ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

পোল্ডার

অধিক ফসল উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গণমানুষকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে নোয়াখালী জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১৪২ কি. মি. দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রায় ৯৬ হাজার হেক্টর জমিকে লোনা পানির হাত থেকে রক্ষা করছে। ৯২টি রেগুলেটর ও ৪৭৩ কি.মি. পানি নিষ্কাশন চ্যানেলের মাধ্যমে পোল্ডারগুলো থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয় (সিইআরপি, ২০০০)।

বাঁধ	১৪২ কি.মি.
রেগুলেটর	৯২টি
নিষ্কাশন খাল	৪৭৩ কি.মি.

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

এ জেলায় মোট ২০২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জেলার ১৬% লোক আশ্রয় নিতে পারে। বছরের অন্যান্য সময় এ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, এ জেলায় মোট ৩৫৯টি ক্লাব, ৬৭টি কমিউনিটি সেন্টার, ১১৭১টি সমবায় সমিতি, ১১টি পেশাজীবী সংগঠন আছে। ২,৭৭২ টি মসজিদ, ১৫৮টি মন্দির ও ২টি চার্চ আছে।

এ ছাড়া ৮টি সিনেমা হল, ১৪টি লাইব্রেরি, ১টি টাউন হল, ২টি অডিটোরিয়াম এবং ৭৪টি খেলার মাঠ আছে। এ ছাড়াও আছে ১টি লিটারারি সোসাইটি, ৫টি থিয়েটার গ্রুপ, ২টি থিয়েটার মঞ্চ, ২টি নারী সংগঠন, ১টি শিল্পকলা একাডেমি, ১টি শিশু একাডেমি ও ৩টি কম্যুনিটি সেন্টার।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

ব্যাংক ও ঋণ সুবিধা : নোয়াখালী জেলায় প্রধান সবগুলো ব্যাংকেরই শাখা রয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার ব্যাংকগুলোতে প্রায় ছয় হাজার তিন'শ মিলিয়ন টাকা জমা ছিল। এ সঞ্চয় ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক বেশি এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

অপর আরেক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রধান চারটি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী এনজিও (ব্র্যাক, আশা, কারিতাস ও প্রশিকা) জেলার প্রায় ১৭% পরিবারকে ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক স্থানীয় এনজিও ঋণ দিয়ে থাকে। এদের মোট সংখ্যা ৯টি, সদস্য সংখ্যা ৪৬,৭৩৩ জন (যার মধ্যে ৮৬% নারী) এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৯ কোটি টাকা।

হাট-বাজার ও বন্দর : ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, নোয়াখালী জেলায় মোট ৩১টি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে। প্রতিটি কেন্দ্র গড়ে ১১৬ বর্গ কি.মি. লোকদের সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি ৮০ বর্গ কি.মি তে একটি কেন্দ্র আছে, যা জেলার হাট-বাজারের অপ্রতুল অবস্থার কথা তুলে ধরে।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ : ২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, জেলার মোট ২৯% বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৫৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ২৬%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ১০% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। এ জেলায় মোট ২,০০২ টি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

এ জেলায় প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প কেন্দ্র রয়েছে। এদের মধ্যে পাট কল, ধান মাড়াইর কল, আটা তৈরির কল, তেল তৈরির কল, রাসায়নিক কারখানা, সাবান তৈরির কারখানা, ছাপা খানা, রুটি ও বিস্কুট কারখানা, বরফ কল এবং লোহা-লক্কর ও ঝালাইয়ের কারখানা অন্যতম।

কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজ, মাদুর ও পাটি বোনা, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, পিতল ও তামার কাজ, দর্জি প্রভৃতি অন্যতম।

কৃষি অবকাঠামো

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই কৃষি অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। নোয়াখালী জেলার মোট আবাদকৃত জমির মাত্র ২১% জমিতে সেচ দেয়া হয়। এ হার উপকূল গড়ের চেয়ে কম (৩০%) এবং বাংলাদেশ গড়ের (৫০%) চেয়ে অনেক কম। আবার প্রায় ১৭% জমিতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে সেচ দেয়া হয়। জেলায় মোট ৪৯৪টি অগভীর নলকূপ, ৫৮টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ৩,৩১৯টি এলএলপি আছে। কৃষি শুমারী থেকে দেখা যায় ৮৩% গ্রামীণ পরিবার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে, ৩৪% পরিবার ট্রাক্টর ও ২৪% পরিবার পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে থাকে। প্রায় ৯ শতাংশ বাড়িতে ধান মাড়াইর কল আছে। ৫৩% বাড়িতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বি.বি.এস (১৯৯৮)-এর তথ্য অনুসারে এ জেলায় মোট ৩৪টি গুদাম রয়েছে, যাদের মোট ধারণক্ষমতা হল ২২,০১৫ মে. টন।

সেচ এলাকা (মোট)	৩০,২৩৩ হেক্টর
সেচ এলাকা (%)	২১%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	১৭%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	৪%

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	২৯	১৯,৫১৫
বীজ	২	৫০০
সার	৩	২০০০

এখানে ৬২টি ডেইরি ফার্ম, ১২৯টি পোলট্রি, ৬০টি মাছের খামার, ৩২টি হ্যাচারী, ১টি কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র ও ১টি সরকারি পশুপালন খামার রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় (পিডিও-আইসিজেডএমপি ২০০৪) দেখা যায়, নোয়াখালী জেলায় ১৯টি সরকারি প্রকল্প চালু আছে। এ প্রকল্পগুলো ১০টি সরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিসিক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, নতুন ও পুরাতন ডাকাতিয়া ও ফেনী নদী উন্নয়ন প্রকল্প, উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার পুণর্বাসন প্রকল্প, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র পুণর্বাসন প্রকল্প, বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, বৃহত্তর নোয়াখালী মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরন প্রকল্প, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প অন্যতম। জেলার উন্নয়নে এনজিওদের অবদানও অনস্বীকার্য। এ জেলায় কর্মরত প্রধান এনজিওগুলোর মধ্যে এনআরডিএস, উপমা, নিজেরা করি, সাগরিকা, বন্ধন, হোপ, কেয়ার, এমসিসি, আশা, এম.এম.সি, রিক, ব্রাক, প্রশিকা অন্যতম।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
মৎস্য অধিদপ্তর	১
পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১
বিসিক	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

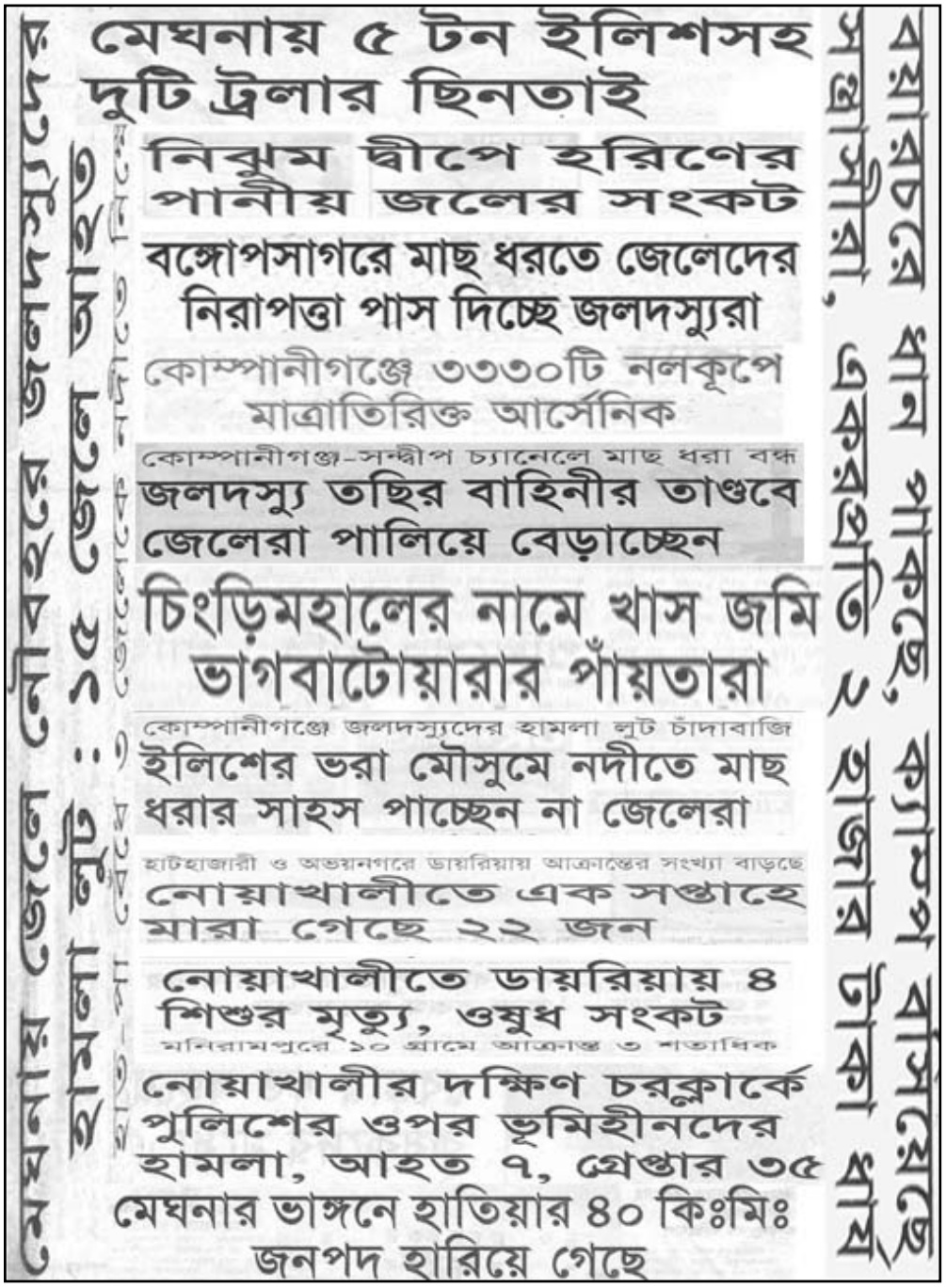

মেঘনায় জেলে নৌবহরে জলদস্যুদের
হামলা লুট : ১৫ জেলে আহত
হাত-পা বেঁধে ৩ জেলেকে নদীতে নিক্ষে

মেঘনায় ৫ টন ইলিশসহ
দুটি ট্রলার ছিনতাই

নিঝুম দ্বীপে হরিণের
পানীয় জলের সংকট

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে জেলেদের
নিরাপত্তা পাস দিচ্ছে জলদস্যুরা

কোম্পানীগঞ্জে ৩৩৩০টি নলকূপে
মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক

কোম্পানীগঞ্জ-সন্দ্বীপ চ্যানেলে মাছ ধরা বন্ধ
জলদস্যু তছির বাহিনীর তাণ্ডবে
জেলেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

চিংড়িমহালের নামে খাস জমি
ভাগবাটোয়ারার পাঁয়তারা

কোম্পানীগঞ্জে জলদস্যুদের হামলা লুট চাঁদাবাজি
ইলিশের ভরা মৌসুমে নদীতে মাছ
ধরার সাহস পাচ্ছেন না জেলেরা

হাটহাজারী ও অভয়নগরে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে
নোয়াখালীতে এক সপ্তাহে
মারা গেছে ২২ জন

নোয়াখালীতে ডায়রিয়ায় ৪
শিশুর মৃত্যু, ওষুধ সংকট
মনিরামপুরে ১০ গ্রামে আক্রান্ত ৩ শতাধিক

নোয়াখালীর দক্ষিণ চরক্লার্কে
পুলিশের ওপর ভূমিহীনদের
হামলা, আহত ৭, গ্রেপ্তার ৩৫

মেঘনার ভাঙ্গনে হাতিয়ার ৪০ কিঃমিঃ
জনপদ হারিয়ে গেছে

সন্ন্যাসীরা, একরপ্রতি ২ হাজার টাকা দাবি

বয়ারচরে ধান পাকছে, ক্যাম্প বসিয়েছে

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

নোয়াখালী জেলার মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, অপরদিকে পারিপার্শ্বিকতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এ জেলার মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙনের সাথে লড়াই করে আসছে। নীচে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত প্রধান কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যা
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস
- বন্যা
- নদী ভাঙন
- বন উজাড়
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- আর্সেনিক
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- জলাবদ্ধতা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- চরাঞ্চলের জীবন

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : স্মরণকাল থেকেই নোয়াখালী জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে আসছে। মাত্রাগত দিক দিয়ে এ জেলা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং জেলার কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া ও নোয়াখালী সদর উপজেলার লোকজন বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। জেলায় অবস্থিত সাইক্লোন শেল্টারগুলো মোট জনসংখ্যার ১৬% লোককে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় দিতে পারে, যা মোটেও যথেষ্ট নয়।

নদী ভাঙন : নদী ভাঙন জেলার মানুষের একটি বড় সমস্যা। নদীর ক্রমাগত ভাঙন ঘরবাড়ি, বাগান, কৃষিজমি, সরকারি সম্পত্তি, অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর ক্রমাগত ক্ষতি সাধন করে চলছে। প্রতি বছরই অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে, কৃষিজমি বিলীণ হয়ে যাচ্ছে ।

বন্যা : নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতার সাথে সাথে বন্যাও এই জেলায় একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দেয়। জেলায় অনেক নিচু জমি থাকার ফলে বন্যার পানি সরে যেতেও বিলম্ব হয়।

বন উজাড় : বন ধ্বংস ঠেকানোর জন্য সরকারের সর্বাত্মক পদক্ষেপ সত্বেও আশংকাজনক হারে বন উজার হয়ে যাচ্ছে। এই হার অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পুরো জেলাই বনশূন্য হয়ে পরবে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : দীর্ঘদিন ধরে দেশী জাতের মাছ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। জলাভূমি, পুকুর, নদী থেকে দেশী জাতের মাছের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বছর কয়েক আগেও জেলার জলাভূমিগুলো বিভিন্ন জাতের দেশী মাছ যেমন ইলিশ, রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, শোল, মাগুর, কই, শিং, পুটি, সরপুটি, টাকি, আইড়, বাইন, ভেদা, তেলাপিয়া, টেংরা, মলা, ঢেলা প্রভৃতি মাছে পরিপূর্ণ ছিল।

আর্সেনিক : আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে নোয়াখালী অন্যতম। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে ৬৯ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা

স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এত বেশিমাত্রার আর্সেনিক যে শুধু ত্বকের রোগই সৃষ্টি করে তা নয়, বেশি দিনের সংক্রমণে এটি ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : সমুদ্রের লোনা পানির অনুপ্রবেশ, মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস, জলবায়ুর পরিবর্তন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত প্রভৃতি কারণে জেলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে চরগুলোতে তীব্র লবণাক্ততা দেখা যায়, যা শুধু কৃষি ও ফসলের ধরণ ও উৎপাদনেই প্রভাব বিস্তার করে না মানুষের নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন কারণে আশংকা করা হচ্ছে এই জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

জলাবদ্ধতা : জেলায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান সমস্যা। বর্ষাকালে পানি জমে থাকার কারণে জেলায় নিচু এলাকায় রোপা আমন ধানের সুযোগ থাকলেও তা করা যায় না।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : যদিও রাস্তা ঘাটের গড় ঘনত্ব উপকূলীয় গড়ের সমান কিন্তু এগুলো মূলত মূল ভূ-খণ্ডেই অধিকমাত্রায় আছে। মূল ভূ-খণ্ড থেকে দ্বীপগুলোতে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম জলপথ। নৌযান ও সি-ট্রাকগুলোর চলাচল জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে। আবার জলযানগুলো সুষ্ঠু ডিজাইনের অভাব, অতিরিক্ত লোক বহন, চালকদের প্রশিক্ষণের অভাব, ডুবো চর ও নদীর তীব্র স্রোত, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি কারণে নিরাপদ নয়। নদী বন্দর ও ঘাটের খারাপ অবস্থার কারণে বিশেষ করে শিশু ও নারীরা সমস্যার সম্মুখীন হন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নোয়াখালী জেলার জন্য একটি বড় সমস্যা। বিস্তীর্ণ চর ও দ্বীপাঞ্চল থাকার কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সব সময় সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। নোয়াখালী জেলায় এক একটি ইউনিয়নের গড় আয়তন ৪২ বর্গ কি.মি., যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাবে চরগুলোতে সারা বছরই এবং বিশেষ করে ফসল কাটার মৌসুমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটে। দস্যুরা জোর করে ফসল কেড়ে নিয়ে যায়, চাঁদা দিতে বাধ্য করে, নদীবক্ষ ও সাগরে করে ডাকাতি। আবার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায় যে, এ এলাকায় বিপুল পরিমাণ চোরাচালান হয়, যার ফলে সরকার হারাচ্ছে মূল্যবান রাজস্ব।

চরাঞ্চলের জীবন : নোয়াখালী বিস্তীর্ণ ধু-ধু চরে মানুষের এক দুর্বিসহ জীবন। এখানে খাদ্য, পানি, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ কোন কিছুর সুবিধা নেই। কিন্তু আছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভাঙন, লবণাক্ততা, গবাদি পশুর মড়ক। আছে অসুস্থতা, মহামারি, ডাইরিয়া ও আর্সেনিকের প্রকোপ। কাজের অভাব এখানে সারা বছরই লেগে থাকে। ফলে পুরুষরা কাজের সন্ধানে হয় গঞ্জ ও শহরমুখী। নারীরা হয় আরো বিপদগ্রস্ত। জলদস্যু, বন দস্যু ও ডাকাতদের প্রকোপে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয় ব্যাহত। সরকারি

শাসন ব্যবস্থা ও সেবা এখানে কার্যকর থাকে না বললেই চলে। ফলে চলে জোতদার, রাজনৈতিক নেতা, টাউট, মাস্তান ও বিভিন্ন বাহিনীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। জনগণ হয়ে পড়ে তাদের হাতে জিম্মী। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাবে যৌতুক, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহের প্রকোপ এখানে অনেক বেশি। তার উপর কষ্টার্জিত উপার্জনের বেশিরভাগই হয় অন্যদের হাতে চলে যায় অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের জীবন হয় আরো বিপদগ্রস্ত।

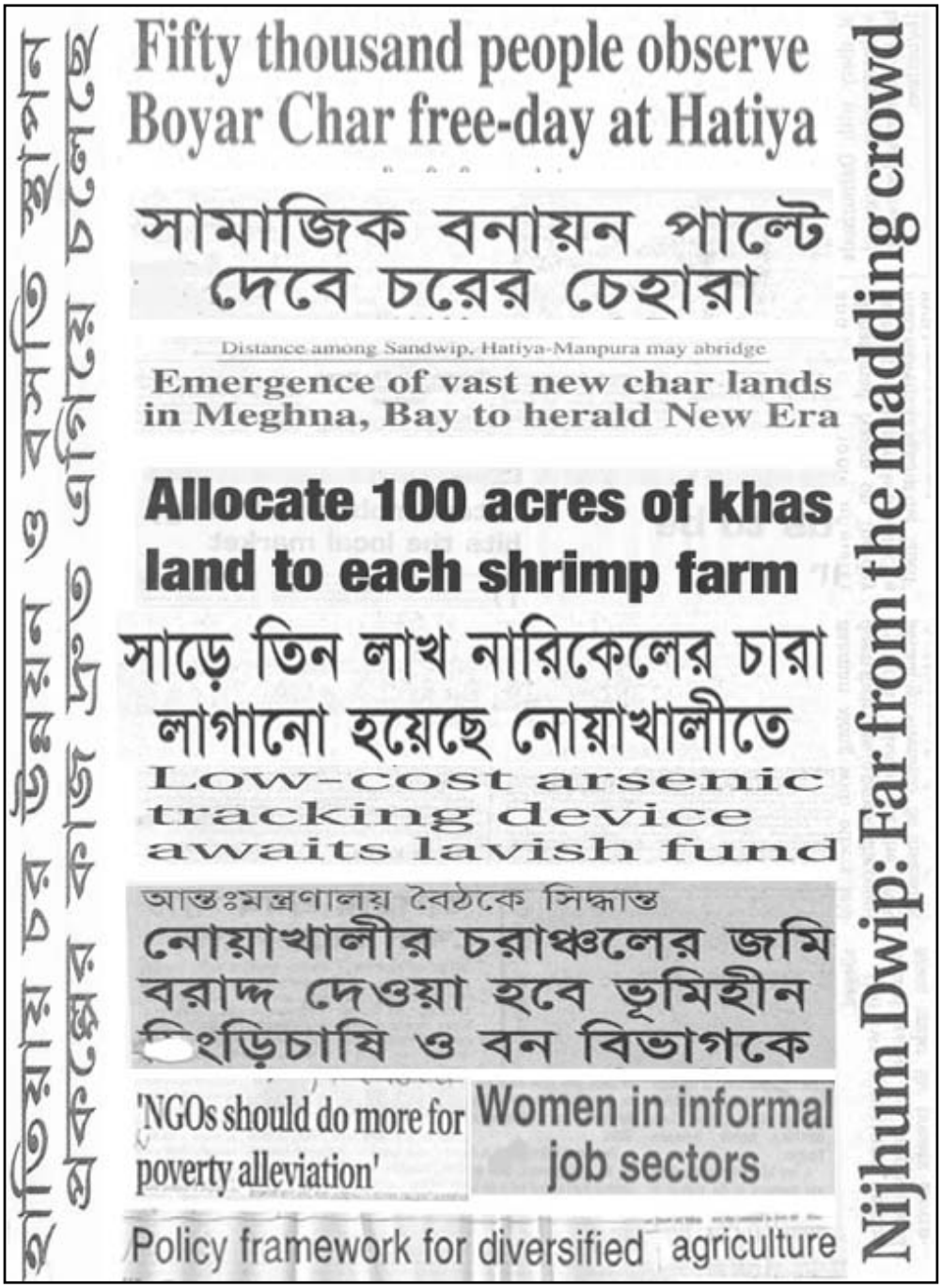

হাতিয়ায় চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন
প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

Fifty thousand people observe Boyar Char free-day at Hatiya

সামাজিক বনায়ন পাল্টে দেবে চরের চেহারা

Distance among Sandwip, Hatiya-Manpura may abridge

Emergence of vast new char lands in Meghna, Bay to herald New Era

Allocate 100 acres of khas land to each shrimp farm

সাড়ে তিন লাখ নারিকেলের চারা লাগানো হয়েছে নোয়াখালীতে

Low-cost arsenic tracking device awaits lavish fund

আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত

নোয়াখালীর চরাঞ্চলের জমি বরাদ্দ দেওয়া হবে ভূমিহীন চিংড়িচাষি ও বন বিভাগকে

'NGOs should do more for poverty alleviation'

Women in informal job sectors

Policy framework for diversified agriculture

Nijhum Dwip: Far from the madding crowd

সম্ভাবনা ও সুযোগ

নোয়াখালী জেলার মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্পদ ও সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করে জেলার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান সম্ভাবনার কথা নিচে আলোচনা করা হল।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- মাছ চাষ
- হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন
- চিংড়ি চাষ

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ
- সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ
- বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জমি উদ্ধার
- জমির সুষ্ঠু ব্যবহার
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

শিল্প উন্নয়ন
- ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার
- শিল্পাঞ্চল

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- দ্বীপাঞ্চলের উন্নয়ন
- অবকাঠামো সংরক্ষণ
- নিরাপদ পানি সরবরাহ

কৃষি উন্নয়ন : জলাবদ্ধতা এবং লবনাক্ততা কৃষির উন্নয়নে একটি প্রধান বাধা। বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ, রোপা, আমন এবং রবি শস্যের প্রচুর পরিমাণ আবাদ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সুষম সার প্রয়োগ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মাছ চাষ : নোয়াখালী জেলার প্রায় ৭০% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বছরে ৩.৮ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ৩০%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ১.৭৪ মে.ট./হে.। এর হার উপকূলীয় ও বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু যদি জেলার সমস্ত পুকুরগুলোকে উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা হয় তবে উৎপাদন আরো অনেক বাড়তে পারে।

হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন : নোয়াখালী জেলায় প্রচুর পরিমাণ পুকুর আছে যেখানে হাস পালন সম্ভব। এ ছাড়া চরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা গরু-মহিষের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উন্নতমানের প্রাণী খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা এবং পণ্য বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হলে এ জেলায় গবাদি পশুপালনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

চিংড়ি চাষ : নোয়াখালী জেলার ঈষৎ লবণাক্ত মাটি ও পানি গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। বর্তমানে চর এলাকার প্রচুর পরিমাণ জমি চিংড়ির ঘের তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি উন্নত ও পরিবেশবান্ধব নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয় তবে তা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ : নোয়াখালী জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সামুদ্রিক মাছ ধরে তাদের মাছ জীবিকা নির্বাহ করে। উন্নত মাছ ধরার উপকরণ, বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, সমুদ্রে নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা গেলে মাছ আহরণের পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন এবং মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও ফড়িয়াদের উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা জেলেদের মাছের উপযুক্ত মূল্য পেতে সহায়তা করবে। তবে মৎস্য আইনের যথাযথ

প্রয়োগের মাধ্যমে তীরবর্তী এলাকার মাছের উপর চাপ কমিয়ে আনতে হবে এবং গভীর সমুদ্রের মাছের আহরণ বাড়ানো সম্ভব । নোয়াখালীতে কাঁকড়া চাষের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু এলাকায় কাঁকড়া চাষ শুরু হয়েছে। তবে এ হার আরো বাড়ানো সম্ভব ।

বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ : নোয়াখালী জেলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় প্রচুর পরিমাণ এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করা হয়েছে। এ বন একদিকে যেমন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কমায় অপরদিকে স্থানীয় লোকজনের কাঠ, জ্বালানি, পশু খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। যদিও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে অনেক এলাকাতেই বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বনজ সম্পদের চাহিদা রয়ে গেছে। তাই স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বাঁধ, রাস্তা, সাইক্লোন শেল্টার, স্কুল, অফিস, খাস জমিতে সামাজিক বনায়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে বন বিভাগের এ সংক্রান্ত একটি উদ্যোগের অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জবরদখলকৃত ১০০ হে. বনভূমিতে ১৬৬টি পরিবারকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন করা হয়েছে।

জমি উদ্ধার : নোয়াখালী জেলায় প্রতি বছর নতুন চর জেগে ওঠে। এ হার বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন, ক্রস ড্যাম তৈরি, ম্যানগ্রোভ বনায়ন, পোল্ডার তৈরি প্রভৃতির মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে। যদিও অধিকাংশ সময় এ সব এলাকা আইন-শৃঙ্খলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে এ জমিগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব । আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমিগুলো বন বিভাগ ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। চলমান 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প' এ বিষয়ে একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে। তারা এ পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বণ্টন ও তাদের পুনর্বাসন করেছে। প্রকল্প মেয়াদকালে তারা মোট ১৩,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন করবে।

জমির সুষ্ঠু ব্যবহার : সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নোয়াখালী জেলার জমির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। উপযুক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বাঁধ পুনর্বাসন, খাল খনন, নদী ভাঙনরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে জমির নিবিড় ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ : নোয়াখালী জেলার নিঝুম দ্বীপে একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য ও জাতীয় উদ্যান আছে। এখানে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হয়েছে এবং সুন্দরবন থেকে হরিণ এনে ছাড়া হয়েছে। এ জেলার চর ও দ্বীপগুলোতে শীতকালে অতিথি পাখিরা আশ্রয় নেয়। এ ছাড়া জেলার অববাহিকা ও উপকূল তীরবর্তী পানিতে বিভিন্ন ধরনের লোনা ও মিঠা পানির মাছ ও প্রাণী বাস করে থাকে। তাই এ জেলা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে। এছাড়া এটি একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রও হতে পারে। নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে "নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প উন্নয়ন

ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার : এ জেলায় কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল যেমন পাট, তৈলবীজ, নারিকেল, সুপারি, ছন, বাঁশ, বেঁতভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। এ জন্য জনগণকে

প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা করা যেতে পারে। উন্নত পদ্ধতিতে শুঁটকি মাছ প্রস্তুতেও এই জেলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

শিল্পাঞ্চল: ৬টি উপজেলায় ৬টি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে। এ সকল শিল্পাঞ্চলে স্ব স্ব উপজেলার প্রবাসীরা বিনিয়োগ করবেন। সরকার সব ধরনের অবকাঠামো এবং আইনগত সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। ব্যক্তিখাতেও সার্বিক সহযোগিতা দেবেন।

আর্থ-সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন

দ্বীপাঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা : নোয়াখালী জেলায় বেশ কয়েকটি মানব বসতিপূর্ণ দ্বীপ আছে। প্রাকৃতিক কারণে এসব দ্বীপের অধিবাসীরা বিপদসংকুল অবস্থায় থাকে। তদুপরি পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও পরিবেশের অভাবে জনগণের সামাজিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। তাই এ সব এলাকার উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার ও তা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

অবকাঠামো সংরক্ষণ : নোয়াখালী জেলা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ জেলা। তাই জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো যেমন বাঁধ ও পোল্ডার, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর, সাইক্লোন শেল্টার ও সংযোগ সড়ক, কিল্লা ইত্যাদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দ্বীপগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে জেলার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ক্ষমতা বাড়ানো দরকার, যাতে জেলার সমস্ত লোকই ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় নিতে পারে। এ ছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত ব্যবস্থারও উন্নতি করা দরকার।

নিরাপদ পানির ব্যবস্থা : আর্সেনিকের প্রকোপ কমানোর জন্য আর্সেনিক মিটিগেশন প্রজেক্টের অধীনে আর্সেনিক দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি নোয়াখালী জেলায় প্রচলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে দুই বালতি পদ্ধতি অন্যতম। এতে একটি বালতির ২০ লিটার পানিতে ৩.৯৪ গ্রাম ফিটকারি এবং ০.০৪ গ্রাম পটাশিয়াম ও বালির ফিল্টার ব্যবহার করে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রয়েছে শাপলা ফিল্টার, স্টার ফিল্টার। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে এবং কূয়া খননের ব্যবস্থা করে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়। ৩০ ফুট গভীর কূয়া হতে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়। এ ছাড়া পন্ড স্যান্ড ফিল্টার পদ্ধতির মাধ্যমে যে সব পুকুর ব্যবহার বা মাছ চাষ করা হয়নি সে সব পুকুর থেকে পানি তুলে বালির মাধ্যমে ফিল্টার করে নিরাপদ পানি পাওয়া যাচ্ছে। তদুপরি মিনি পাইপ ওয়াটার ফিল্টার চালু করা হচ্ছে। এক একটি আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ থেকে সরু পাইপের সাহায্যে ৫০/৬০টি ঘরে পানির লাইন দিয়ে পাম্পের সাহায্যে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ছাড়া যে সমস্ত নলকূপের পানিতে অধিক আর্সেনিক রয়েছে সে সমস্ত নলকূপে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০০১	২০১৫	২০৫০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	২৫.৭০	৩১.১	৪৩.৮
পুরুষ	১২.৬৭	১৫.৩	২১.৯
নারী	১৩.০৩	১৫.৮	২১.৯
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:৯৭	১০০:৯৭	১০০:১০০
শহুরে জনসংখ্যা (%)	১১	১২	১৭

নোয়াখালী জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ২৫.৭১ লাখ (২০০১)। ধারণা করা হচ্ছে এ লোকসংখ্যা বেড়ে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ৪৩.৭ লাখ। ২০১৫ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এ সময় নাগাদ লোক সংখ্যা হবে ৩১.১ লাখ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অবকাঠামো ও সরকারি পরিসেবার আরো অগ্রগতি হবে।

বর্তমানে জমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জমির উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ বসবাসের উপযোগী করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার ক্রসড্যাম ও বাঁধ তৈরি করে জমি উদ্ধার করা হয়। জেগে ওঠা জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করে জমির উন্নয়ন করা হয়। পরে এ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বর্তমানে চরাঞ্চলের জন্য সরকার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা করছে। এ প্রক্রিয়া চালু রাখা হলে ভবিষ্যতে এ জেলায় আরো বিপুল পরিমাণ জমি উদ্ধার করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও বর্তমানে বেশ কিছু উপজেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম। উপযুক্ত অবকাঠামো সুবিধার ব্যবস্থা করা হলে এসব উপজেলা বসবাসের জন্য আরো আকর্ষণীয় হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে হাতিয়া নিঝুম দ্বীপ সংযোগ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। গত ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি প্রকল্প সারপত্র তৈরি করা হয় এবং ১৩ আগষ্ট ২০০৩ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে নোয়াখালী ও সন্দ্বীপের পাশে সংযোগ বাঁধ দেয়া হবে। প্রকল্প সারপত্রে ১ কি.মি. ১১৭ মিটার দীর্ঘ এ বাঁধটির নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে ৩৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। এর পুরোটাই সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে আসবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নোয়াখালীর উপকূলের ভূ-প্রকৃতিতে বিরাট পরিবর্তন আসবে। বাঁধটি স্থাপিত হবে হাতিয়া এবং নিঝুম দ্বীপের মধ্যে। ফলে এর পূর্ব পশ্চিমে মেঘনার পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর জাগতে পারে। ফলে বিপুল পরিমাণ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা যাবে। তবে এ বাঁধের ফলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাবও পড়তে পারে। ইলিশের আবাসনের ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষিত নিঝুম দ্বীপের চরিত্রই বদলে যাবে। যোগাযোগ সহজ হলে দ্বীপে জনবসতি বাড়বে। ফলে বন উজার হয়ে স্থানীয় জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বন বিভাগের সামাজিক বনায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেলার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা সড়ক ও বাঁধের পাশে বিভিন্ন রকম গাছ যেমন মেহগনি, শিশু, পেয়ারা, বাবলা, নিমগাছ এবং বিভিন্ন রকম সবজি যেমন বেগুন, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া লাগিয়ে থাকেন। সবজির পুরোটাই উপকারভোগীরা নেন। গাছের মালিকানা হয় যৌথ। গাছের যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন তার মালিকানা ৫৫%। বন বিভাগের ১০%, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ৫%, বাঁধ বা সড়কের মালিক সংস্থা ২০% এবং অবশিষ্ট ১০% পায় বন বিভাগের ট্রি ফার্মিং ফান্ড। এ প্রক্রিয়া বর্তমানে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে। নোয়াখালী বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থেকে জানা যায় যে, নোয়াখালী জেলা বন বিভাগের আওতাধীন সমস্ত জমি যদি যথাযথ বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার আওতায় আনা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে এ জেলা সমগ্র সুন্দরবনের চেয়ে বেশি পরিমাণ কাঠ উৎপাদন করতে পারবে।

নোয়াখালী জেলায় আরো গ্যাস ক্ষেত্র পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেয়ার্ন বেশ কিছু ভূ-কম্পন (সিসমিক) জরিপ চালিয়েছে। যদি যথাযথভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় তবে এ জেলায় গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

নোয়াখালী জেলায় কৃষি ও মৎস্যভিত্তিক মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তন, নদী প্রবাহ হ্রাস, নদী প্রবাহের দিক পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে নোয়াখালী জেলার বিপুল এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত হুমকির সম্মুখীন।

দর্শনীয় স্থান

নোয়াখালী জেলার একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আছে। নোয়াখালীতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। যেমন নোয়াখালী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৫ সালে নির্মিত), কারা শাহি মসজিদ (১১৫৩ সালে নির্মিত, চাটখিলে অবস্থিত), কালিমূর্তি (১৮০০ সালে নির্মিত, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নে অবস্থিত)। বেগমগঞ্জ উপজেলার বজরা ইউনিয়নে একটি ঐতিহাসিক মসজিদ আছে। পনেরশ শতকে এ এলাকাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বেশ কয়েক জন পীর বা ধর্মপ্রচারক এখানে আসেন, তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য দিল্লীর বাদশার কাছে এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য আবেদন জানান। ফলে দিল্লীর স্থাপত্য রীতি অনুসারে এ মসজিদটি স্থাপন করা হয়।

এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বেশ কিছু স্থান রয়েছে। এদের মধ্যে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার স্লুইস গেটের কাছে গণহত্যার স্থানটি অন্যতম। এ জেলা প্রচুর ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী, যেমন ১৯৩০ সালের জিহাদ আন্দোলন, ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য ১৯৪৬ সালে নোযাখালী ভ্রমণ করেন। স্মৃতিবিজরিত এ সব স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করা হলে তা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে।

১৯৪৬ সালের ১০ থেকে ২০ অক্টোবর সময়কালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানায় ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণ এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ৭ নভেম্বর, ১৯৪৬ তারিখে বেগমগঞ্জ থানায় আসেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণকালে ২৯ জানুয়ারি, ১৯৪৭ তারিখে গান্ধীজি জয়াগ গ্রামে শুভাগমন করেন। এ স্মৃতি ধরে রাখার জন্য ১৯৭৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং ৫১ বলে 'গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট' সৃষ্টি করে। গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন জিনিষপত্র এবং বই-পত্রাদি নিয়ে এর মূলভবনে একটি জাদুঘর স্থাপন করেছে। ২০০০ সালের ১২ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি গান্ধী স্মৃতিজাদুঘরের উদ্বোধন করেন। এ জাদুঘরে মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালীসহ জীবনের ঘটনাবহুল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। জাদুঘরের জন্য ভারত সরকার ব্রোঞ্জের তৈরি গান্ধীজির একটি আবক্ষ মূর্তি উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

এ ছাড়া বেশ কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকা রয়েছে, যেগুলো পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে।

হাতিয়া উপজেলার অধীনে নিঝুম দ্বীপে অবস্থিত ন্যাশনাল পার্ক ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত। ন্যাশনাল পার্কটি কমলার চর ও চর ওসমান জুড়ে অবস্থিত। কেওরা ও অন্যান্য ম্যানগ্রোভ জাতের গাছ দ্বারা এলাকটি আবৃত। সুন্দরবন থেকে হরিণ এনে এ পার্কে ছাড়া হয়েছে। এ ছাড়া এ পার্কে প্রচুর পরিমাণ মহিষও আছে। এ পার্ক ও তার আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন জাতের প্রচুরসংখ্যক পাখি দেখা যায়, যা পর্যটকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। কিন্তু, উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাত্রি যাপনের সুবিধা, নিরাপত্তা,

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের অভাবে পার্কটিতে যে পরিমাণ লোক সমাগম হওয়ার কথা তা হয় না। যদি এ সব দিকে সুনজর দেয়া হয় তবে ন্যাশনাল পার্কটি একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে।

এ জেলায় দ্বীপ পর্যটনের ভালো সুযোগ রয়েছে। উপযুক্ত অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা গেলে হাতিয়া, বয়ারচর, বাদনের চর, ডামার চর, চর বন্দরটিলা, বুড়ির চর, চর জাহাজমারা/চর ম্যাকফরসন, চর কিং, দক্ষিণ হাতিয়া, মৌলভীর চর/ ডিক্রির চর, ঢাল চর ইত্যাদি দ্বীপগুলোও পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

নদী ও সাগর ভ্রমণও জেলার একটি আর্কষণ। বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এ জেলা অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করে। একদিকে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল এক অন্য রকম সৌন্দর্যের ছোয়া দেয়, তেমনি বঙ্গোপসাগরের বিশাল ব্যাপ্তি মানুষের মনে সমীহ জাগিয়ে তোলে। যদি বেসরকারি উদ্যোগে নদী ও সাগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয় তবে তা বহুসংখ্যক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নোয়াখালী জেলার উপকূল জুড়ে বিস্তীর্ণ গাছপালার সবুজ বেষ্টনি স্থানীয় জনগণের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

আঞ্চলিক গোল টেবিল বৈঠক, নোয়াখালী	**ডিসেম্বর, ২০০১**
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যয়ন	**জুলাই-আগষ্ট, ২০০২**
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প : একটি কেস স্টাডি	**ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ২০০৩**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**মে-সেপ্টেম্বর, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।